নাগা

কে না দেখেছে বেতের ঝাঁপির গোল ঢাকনাটা তোলার পর খোঁচা খেয়ে সড়াৎ করে ফনাটা উঠে আসে! অবশ্য তার আগে ঐ ঝুড়ির চারপাশে আমাদের রঘু ঘুরতে থাকে আর বিড়বিড় করে— ''শালা, শুয়ে আছে দেখ, যেন মরে গেছে। দেব তোর চামড়াটা বেচে ঐ ব্যাগওলার কাছে। ভাল মাল পাওয়া যাবে।'' তারপরেই ঢাকনা তুলে আঙুল দিয়ে এক আশ্চর্য খোঁচা মারে। খোঁচা খেয়ে 'নাগ' ফণা তোলে,...হিলহিল করে দোলে। এইবার রঘুর সংলাপ শুরুঃ ''এটা কোনো গোখরোই নয়। গোখরো হল রাজার জাত। সে কখনো এত কুঁড়ে হতে পারে না। রাজা যদি এলিয়ে থাকে, ঘুমোয়, তাহলে কি করে চলবে। রাজাকে সব সময় ফণা তুলেই থাকতে হবে, ফোঁস ফোঁস করতে হবে, তবে না দেশ চলবে। এটার সে সব কিছু নেই। সাপ তো নয়, যেন কেঁচো। তুই যদি ফোঁস ফোঁস না করিস, যদি ফণা না দোলাস, যদি ছোবল দেওয়ার ভান না করিস, তবে সাপুড়ে খাবে কি? এই যে বাসস্ট্যান্ডে এতক্ষণ ভিখারির মত ভিক্ষে করছি, কেউ কি তোর মত একটা মড়াকে দেখে দুটো পয়সা ফেলল! এবার দেখছি কপালে আছে খিদে পেটে স্বপ্নে যাওয়া।''

এদিকে পাড়ার ভেতরও খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না রঘুর। প্রথমত পাড়াগুলো পাল্টে গেছে। সকাল তেকেই ছোটগুলো ইস্কুলে। তাদের এসব সাপখেলা টেলা দেখতে দেওয়া হবে না। বাকী থাকে ফ্ল্যাট বাড়ীর দারোয়ান আর ঝিগুলো। তারা খেলা দেখবে কিন্তু পয়সা ফেলবে না। অথচ একসময় সে তার বাবাকে দেখেছে। তখন বাড়ীগুলোর চওড়া রক ছিল। দু-তিনটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হত। ওর বাবার কানে কারুর কোনো কথাই ঢুকত না সোজা উঠে বসত কোন একটা রকে। বাঁশীতে ফুঁ দিত। আর আস্তে আস্তে ঝাঁপির ঢালা তুলত। সুর ক্রমশ তীক্ষ্ণ চেনা গানের মিউজিক, নাগা দুলতে শুরু করত আর চারপাশে লোক জমত, মোটামুটি একটা ভীড় হয়েছে মনে হলেই, সে বাঁশী থামিয়ে ভাষণে চলে যেত ঃ শুনুন, আপনারা সক্কলে শুনুন কাল স্বপ্নে কি কি হল। মহাদেব দাঁড়িয়ে আছেন, বলছেন ঃ আমার পবিত্র বেদীর নীচে যে সরা আছে সেখানে তোর মুণ্ডটা রাখা। আর দেখ আমার মাথার চুলে গোখরো কেমন ভাবে বাঁধা আছে, তার ফণা আমার ছাতা। আরও দেখ, ভাব, ভগবান বিষ্ণু কিরকম আদি শেষ নাগের কুণ্ডলীর ওপর ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঐ সেই মহা শক্তিশালী শেষনাগ যে হাজার হাজার বছর ধরে এই মহাবিশ্ব মাথায় করে রেকেছে। দেখ পার্বতীর ওপর হাতের গয়না। তবে। এত সবের পরেও আমরা নিজেদের পণ্ডিত ভাবি। এরা কিনা দেবদেবীদের গয়না। এরা তাদেরই রূপের অংশ। ঐ রাত্রেই আমি মহাদেবের নির্দেশ মতো বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম তার সেই ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে। সরু একটা ভাঙা নালা। সেকানে একটা বেশ বড় গর্ত। আমি ঠাকুরের নির্দেশ মতো তার ভেতরে হাত চালালাম।

ঠিক এইখানটাতে ভীড়ের মধ্যে থেকে কেউ না উে একটু কেঁপে উঠে বলত— তোমাকে কামড়াল?

—হ্যাঁ। অবশ্যই। তাহলে আপনি এখনও আমাকে এখানে কি করে দেখছেন। দেখছেন কেন না আমাকে তখন কেউ একজন কানে কানে বলল— ঐ দেখ, পাঁচিলের গায়ে ঐ যে বুনো গাছটা বেরিয়ে আছে, ওর কয়েকটা পাতা চিবিয়ে খেয়ে ফেল, আর কয়েকটা পাতার রস ঐখানটায় লাগিয়ে দে। না সে গাছটা কোথায় আমি তা কিছুতেই বলব না। মুঠো মুঠো টাকা পেলেও বলব না। ঐ গাছ আমাকে দেখিয়েছে স্বয়ং মহাদেব। ঐ গাছ তোমরা দেখতেও পাবে না। ভগবান না চাইলে ঐ গাছ কেউ দেখতে পায় না।

—তা পাতা চিবোনোর পর কি হল?

—বিষ আর উঠল না। আর ঐ যে আমার ঝাঁপির ভেতর যে মহাশয়তানটা, ছেলে যেমন মায়ের দুধ টানে, তখন আমার হাত পেঁচিয়ে তার ভয়ানক ধারালো দাঁত দিয়ে আমার আঙুল কামড়ে যাচ্ছে। আমার অবশ্য একটুও ভয় করে নি। হাসতে হাসেতে ওটাকে হাত থেকে ছাড়ালাম। মুখটা চেপে ধরলাম। তারপর একটা পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে বিষ দাঁত ভাঙি। তারপর যা হয়। বিষদাঁত চলে গেল তো ফোঁসফোসানিরও চলে গেল। কামড়ানোর ইচ্ছেটাই চলে গেল। যেন ভোটে হেরে গেল। তার আগ্রাসী ভাবটা চলে গেল। আস্তে আস্তে বুঝতে পারল আমি তার শুধু বন্ধ নয়, তার ভাল মন্দেরও কারিগর। তারপর থেকে আর কোনোদিন সে কোনো সমস্যা করে নি। মোদ্দা কথা হল, সাপ কি? এক দুঃখিত, অনুতপ্ত আত্মা, যে স্বর্গ থেকে এসেছিল, আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য এক পা বাড়িয়ে আছে।

ভাষণ এখানে এসে শেষ হত। সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশী আবার বেজে উঠত আর ঢাকনা উঠত।

উঠত 'নাগা', দুলত তার শরীর। সামনের ভীড়টা এইখানে কোনো অজানা কারণে একসাথে দু পা পিছিয়ে যেত। সামান্য ভীত আবার রোমাঞ্চিতও। তারপরে শুরু হত তার খেলা। যেমন ভীড় জমত, খেলার টাইম সেরকম বাড়া কমা হত। অবশ্য ভীড়ও তাকে সাধ্যমত দিত। পয়সা থেকে চাল, কখনও কখনও পেত কারুর পুরানো শার্ট, প্যান্ট। ডিমওলা মাঝে মাঝে এক আধটা ডিমও দিয়েছে। এইভাবে এ পাড়া, ও পাড়া, বাজার থেকে বাসস্ট্যান্ড সর্বত্র ঝাঁপি নিয়ে বসত, ঝাঁপি খুলে খেলা দেখত আবার শেষে সব গুটিয়ে নিয়ে চলে

যেত অন্য বাজারের খোঁজে, অন্য ভীড়ের সন্ধানে। সারাদিন পরে বাগানের দেওয়াল ঘেঁষে তেঁতুল গাছটার তলায় তার ঘরখানিতে সে ফিরে আসত। ভাত রাঁধত, ছেলেটাকে খাওয়াত আর তার ভরা আকাশের নীচে খাটিয়া পেতে ঘুমিয়ে পড়ত।

সেই শিশু এখন হাঁটতে শিখেছে। সে বাবার পিছনে পিছনে হাঁটে। ধীরে ধীরে শিখে নিয়েছে নাগার সঙ্গে খেলাধূলা, শিখে নিচ্ছে বাবার ভাষা। বাবা তাকে বলেছিল যে কোরেই হোক, সপ্তাহে দুটো ডিম নাগাকে দিতেই হবে। সে জেনেছে নাগারা নাকি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছোট হতে থাকে। প্রতিদিন একটু একটু করে ছোট হয়; তারপর একদিন তার ডানা হয় আর সে উড়ে যায়। ওড়বার আগেই সাপ তার বিষটা ডানার ওপর রেখে দেয়। সেটা একটা দামী পাথরের মত জ্বলজ্বল করে আর সেই পাথর যদি তুমি হাতে পাও, তুমি রাজা হয়ে যাবে।

সেদিন রঘুর খুব কুঁড়েমি লাগছিল। সকাল থেকে ঘরের বাইরের চুপ করে বসেছিল আর দেখছিল ওপারের তেঁতুলগাছটায় এ ডাল করেছে একটু ছোট বাঁদর। বাঁদরকে নিয়ে এতই মগ্ন ছিল, খেয়ালও করে নি কখন তার বাবা ফিরে এসেছে।

'কি রে কী দেখছিস? নে, নে, এটা খেয়ে নে'! বলে তার হাতে একটা মিষ্টির প্যাকেট দিল। ''ইস্কুল পাড়ায়, সে যে বড় বাড়ীটা , সেখানে প্যান্ডেল হয়েছে, তারা দিল। নাগা আজ ওখানে বড় ভাল নেচেছে বুঝলি। নাগা এখন আমার সব কথা বুঝতে পারে। আজকে যখন ওর নাচ শেষ হব হব, হঠাৎ দেখি ও সোজা দাঁড়িয়ে পড়েছে, একেবারে আমার সমান লম্বা। সামনে দিকে ফনাটা মেলে দিয়ে বার দুই এমন হিস হিস আওয়াজ দিয়েছে, সামনের ভিড়টা কোনদিকে দুলবে ঠিক করতে না রে, একেবারে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। লোকে ভয় পেতেও বেশ ভালবাসে। ওরাই আমাকে আজ টাকা দিয়েছে, মিষ্টির প্যাকেট দিয়েছে।''

খুব তৃপ্তির সঙ্গে বুড়ো ঝাঁপি খুলল। নাগাকে তোলে। বুড়ো এক অদ্ভুত কায়দায় এর ঘাড় আর মাথা ধরে মুখটা খোলাল। মুখে মধ্যে একটা বেশ বড় রকমের মিষ্টি ফেলে দেয়। দেখতে থাকল নাগার গলা দিয়ে মিষ্টি কীভাবে নামছে।

—'বুঝলি, নাগাকে নিয়ে আমরা হলাম তিনজন। আমরা যা যা খাব, ওকেও সেইসব খাওয়াতে হবে। ইতিমধ্যে নাগা ঝাঁপির মধ্যে আবার কুণ্ডলী হয়ে পড়েছে দেখে বুড়ো ডাকা নামিয়ে দেয়।

রঘুর কিন্তু এদিকে খুব একটা মন ছিল না। সে মিষ্টি খেতে খেতেই লক্ষ্য রাখছিল বাঁদরের দিকে। সে বলে, 'বাবা, আমার খুব বাঁদর হতে ইচ্ছে করে। মনে হয় সারাদিন এ-ডাল ও ডাল করি। দেখ, দেখ, ওর কেমন মজা। একটা করে তেঁতুল ছিঁড়ছে আর কামড়াচ্ছে। ও হো, আমাকে যদি দু চারটে দিত।'

বুড়ো ছেলেকে বলে, 'আরে তুই যদি ওর বন্ধু হতে চাস, তাহলে ওকে একটু খাবার দে, ওর খাবার চাইতে যাস না।'

রঘু বাবার কথামতো তার হাতে যে মিষ্টির টুকরোটা ছিল সেটা হাতের তালুতে রেখে হাতটা তুলে ধরল আর যেন মা ছেলেকে ডাকছে এমনভাবে ডাকল 'এই বাঁদর খাবি আয়।'

বুড়ো বলল, 'তুই যদি ওকে বাঁদর বলে ডাকিস, ও তোর কাছে আসবে না। তুই ওর একটা ভাল না দে।'

—কি নামে ডাকব?

—ওর নাম দে রাম। রাম হল হনুমানের প্রভু। হনুমান হল পবিত্র বাঁদর, স্বর্গীয়। সমস্ত বাঁদরের দেবতা হল হনুমান। ওরা খুব ভক্তি করে হনুমানকে। তাকে পূজো করে রোজ।''

রঘু সঙ্গে সঙ্গে ডাকতে শুরু করল, ''রাম, রাম নেমে এসো। এই মিষ্টিটুকু খেয়ে নাও।'' বলতে বলতে সে তার হাত দুটোকে আরও উঁচু করে ধরে। ওদিকে রাম গাছের ডাল থেকে সমস্ত ব্যাপারটা খুব মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। তার নেমে আসার তেমন লক্ষন নেই। ওদিকে রঘু বেশ মুষড়ে পড়ছে। রঘু এবার গুঁড়িয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আর নীচের দিকের একটা চওড়া ওপর মিষ্টিটা রাখে; তারপর পিছিয়ে এসে ঘরের দরজার কাছে বসে। ভাবতে লাগল কখন নামবে? তার দেওয়া খাবার সে নেবে কি? এরকম যখন চলছে, ওদিকে রাম ভেতরেও তখন ঝড় চলছে— নামবে কি? নেমে কি খাবারটা? ওটা কি খাবার? কি খাবার? তখন এই বহুদর্শী কাকটি উড়ে এল, ছোঁ মেরে তুলে নিল, চোখের পলকে উড়ে গেল রামের চোখের বাইরে। অবশ্য ততক্ষণে রঘু চীৎকার করে একটা অভিশাপ ছুঁড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবা গর্জন করে উঠল: বাঁন্দর, এ সব গালাগাল তুই শিখলি কোথা থেকে? এ্যাঁ! এসব গালাগাল যদি আর কখনো দিস, তাহলে কোন বাঁন্দর তোর কাছে আসবে না কোনদিন।' বলতে বলতে বুড়ো আর এক টুকরো মিষ্টি ঠিক ওইভাবে ঐ জায়গাতে রখে দিল। এবার রাম নেমে এল। বুড়ো তাকে আশ্চর্য কায়দায় ধরে ফেলে। এমনভাবে ধরল যে রাম দু-চারবার হাত পা ছুঁড়ল বটে কিন্তু আঁচড়াতে কামড়াতে পারল না।

এরপর শুরু বুড়োর কায়দা। বুড়ো জানে বশ মানানোর জন্য কী কী করতে হয়। পনেরোদিন রামকে সে প্রায় কিছুই খেতে দিল না। উল্টে তার চোখের সামনে নানারকম খাবার ঝুলিয়ে রাখত। আর সেগুলো রাখত তার নাগালের সামান্য দূরে। এতেই কাজ হল। রাম বোধহয় বুঝতে শিখল তাকে কি কি করতে হবে আর কি

কি হবে না। প্রথমেই সে বুঝল আঁচড়ে কিংবা কামড়ে দিলে কিছু পাওয়া যাবে না। তারপর বুঝল জীবনের উদ্দেশ্য হল প্রভুর কথামতো চলা, তাঁর নির্দেশমতো কাজ করে যাওয়া। রাম খুব তাড়াতাড়ি শিখল কিভাবে হনুমান তার লেজ বাড়িয়ে দিয়েছিল রাবনের কথাতে। রাবন সেখানে আগুন দিল; তারপর সে কি কি করেছিল; কিভাবে গোটা লঙ্কায় আগুন ধরেছিল। রাম শিখতে লাগল গাঁয়ের গরীব মেয়েটা মাথায় জলের কলসী নিয়ে কিভাবে ঘরে ফেরে; কিভাবে নতুন বর তার বউকে দেখে, বকবক করে, চোখ মারে ইত্যাদি। আর শেষ ট্রেনিং হল, যা সব বাঁদর পারে, সেই বাঁশের ওপর, বাঁশের মাথায় সার্কাস খেলা। এভাবে, এভাবেই রাম তৈরী হয়ে গেল বাইরে খেলা দেখাবার জন্য। বুড়ো রামের একটা টুপিও কিনল। রাম প্রথম প্রথম বিদ্রোহ করেছে। জামা, টুপি যতবার খুলে দিতে গেছে পিছন থেকে ছড়ি পড়েছে সপাৎ করে। তারপর ও বুঝে গেল এসব সকালে পরতে হবে আর সেই সন্ধ্যেয় খোলা হবে। সন্ধ্যেয় এসব খোলা হলেই রাম প্রথমেই দু-চারটে ডিগবাজী খায় পরম আনন্দে। কি স্বস্তি।

গোটা এলাকায় রাম এখন ভীষণ পপুলার। ইস্কুলের ছেলেরা ওকে দেখলেই হৈ হৈ করে ওঠে। কোন শিশু হয়ত কেঁদেই যাচ্ছে, তাকে থামাতে হবে, দাঁড় করাও রামকে। বল দু-চারটে খেলা দেখাতে। ব্যাস, খেলা শুরু হয়ে যাবে। থালায় পয়সা পড়বে, টাকাও, আর রামের জন্য উড়ে আসবে অজস্র বাদাম। সে কুড়োতে থাকবে। শুধু কি এই। কতজন তাদের পুরনো জামাকাপড় দেয়। ছোটদের জামা দেয় রামের জন্য। এরা বাপ ছেলেতে এখন ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়ে। রাম রঘুর কাঁধে বসে আর বুড়া একটু আগে আগে হাঁটে, হাতে সেই পুরনো ঝাঁপি যার ভেতরে কুণ্ডলি পাকিয়ে গোখরো মহারাজ। তবে এখনও গোখরো মহারাজের হিস হিস শুনলে বা ফনা দুলতে দেখলে রামের মুখ ভয়ে কালো হয় যায়। কুঁকড়েও যায়। ভয়ে কিচিরমিচির শুরু করে আর একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে যেতে রঘুর পিছনে চলে যায়। এখন রঘু শুরু করে রামের খেলা আর তার বাবা দেয় বাঁশীতে ফুঁ, ঝাঁপির ঢাকনা তোলে আর সাথে সাথেই হাঁটু দোলাতে শুরু করে। হাটের দিনেই এদের সবচেয়ে জমজমাট ব্যাপার। হাটুরেরা খেলা দেখবেই দেখবে। আজকাল রোজগার এতই বেড়ে গেছে যে বাপ ব্যাটা বেশিরভাগ দিনই বাসে করে বাড়ী ফেরে, হাঁটে না। একদিন কে যাত্রী জিজ্ঞেস করে—এই যে সাপ নিয়ে বাসে উঠছ, যদি ওটা হঠাৎ বেরিয়ে আসে ঝাঁকুনির চোটে, তাহলে কি হবে ভেবেছ?

—কোন ভয় নেই। ভাববেন না বাবু। ঐ ঢাকা লোহার তার দিয়ে বাঁধা আছে। ছিঁড়বেও না, খুলবে না।

আর একজন যাত্রী সেখানে ছিল যে কথা না বলে থাকতে পারে না, বলল—সাপ নিজে থেকে কাউকে কামড়ায় না। কিন্তু তুমি যদি তার লেজে পা দাও...?

যাত্রী শেষ করার আগেই অন্য একজন বলে ওঠে—কিন্তু এই বাঁদরটা! যদি আঁচড়ে কামড়ে দেয়।

বুড়ো দেখল এবার থামাতে হবে নইলে নামিয়ে দিতে পারে। প্রথমেই সেই কন্ডাক্টারের দিকে দুজনের পুরো ভাড়ার সঙ্গে আরো কিছু দিয়ে দিল আর বলল— ওসব আপনারা ভাববেন না গো, ও বাঁদর বটে, তবে ভারী ভদ্র আর কিছুটা জ্ঞানীও বটে।

এভাবেই এই চারটে প্রাণী বাসে বসে দূর থেকে আরও দূরে যেতে লাগল। এ হাট থেকে অন্য হাট। এ মেলা থেকে অন্য মেলা। যত পয়সা আসছে, তত বেশ বেশি ভাড়া দিয়ে অনেক অনেক দূরে ওরা চলে যেত। দুপুরে আজকাল ওরা হোটেলে খায়। রাস্তার ধারে ছাতুওলা কিংবা বেঞ্চে বসে ভাত খাওয়া প্রায় ভুলেই গেল। এরকম সব দিনরাত্রির মাঝেই আজকাল প্রায় সন্ধ্যেতে বুড়োর তলপেটে একটা ব্যথা হচ্ছে। সে রঘুকে ব্যথার কথা বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেত ওষুধের খোঁজে। কোনো কোনো দিন রঘু ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে পারত বাবা ফিরল তবে এখন অনেক রাত। এরকম সময়ে সে চোখ বন্ধ করে থাকত। থাকত ঘুমের ভানে। এইসব মাঝরাত্তিরে বাবাকে দেখলেই তার ভয় করত। বাবার চোখ দুটো কিরকম লাল আর খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। গালাগালি দিত। একদিন মাদুরের ওপর পড়ে থাকতে তার শরীরে লাথি মারল, তাকে খানকির ছেলে বলল। বলল সে তার ছেলে নয়।

সে রাত্রে রঘু ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাবা কখন এসেছিল জানে না। সকালে উঠে বাবাকে দেখতে পেল না। ঘরে রামও নেই। ভাবল তবে কি বাবা আর রাম দুজনে বেরিয়ে গেছে তাকে ডাকেনি। রঘু ঘরের সামনে হাঁটে আর 'বাবা' বলে ডাকে। আবার ঘরের মধ্যে আসে, মাদুরের ওপর বসে আর দেখতে পায় মহারাজের ঝাঁপি। যেখানে থাকে সেখানেই আছে। ঢাকনার ওপর কিছু টাকা পয়সা ছড়িয়ে। রঘু পয়সা আর টাকা গোনে। মনটা একটু খুশী হল। নিজের মনেই বলে উঠল 'এগুলো সব তাহলে আমার'। রঘু বুঝল সে তাহলে বড় হয়ে গেছে এখন তার হাতে অনেক পয়সা। এগুলো সে ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ই মনে পড়ল আজ পর্যন্ত কোনদিন হয়নি ঘুম ভাঙ্গার পরে বাবাকে দেখতে পায় নি। হঠাৎ তার ভেতরে কে যেন বলে দেয় তার বাবাকে সে আর কখনো দেখতে পাবে না।

তাকে না বলে তার বাবা আগে কোনদিন ঘর থেকে যায় নি— এমন কি রাস্তার কলে চান করতে গেলেও বলে গেছে কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে।

রঘুর কিছু একটা মনে হতে সে ঝাঁপির ঢাকা খুলে দেখে মহারাজ আছে কি না? রঘু যেই না মহারাজ

দিকে তাকিয়েছে, মহারাজও এক মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। রঘু ঝাঁপির কাছে গিয়ে বলে ''আজ থেকে আমি তোর সাপুড়ে। যেমন যেমন বলব, ঠিক তেমনটি করবি।'' সে বোধহয় বুঝতে পারে বঘুর কথা। ফণাটা একটুখানি তোলে। জিভটা দুবার লম্বা করে বের করেই ভেতরে টেনে নেয়। আবার যেই ফণাটা তুলতে গেল, রঘু আস্তে করে আঙুল দিয়ে মাথায় টোকা দিয়ে আর বলল, ''এখন নয়। এখন তুই একটু ঘুমিয়ে নে। আমি যখন ডাকব, তখন উঠবি।''

রঘু বন্ধ ঝাঁপির পাশে বসে ভাবল কি কি তার করা উচিত। বাবার জন্য সারাদিন অপেক্ষা করবে, না বেরিয়ে পড়বে। এদিকে খুবই খিদে লাগছে। টাকা তো সঙ্গেই আছে। তা দিয়ে সকালের মুড়ি তরকারিটা হতেই পারে। কিন্তু বাবা যদি এরই মাঝে ফিরে আসে তবে তো দুটো থাপ্পড় খেতেই হবে, সঙ্গে গালাগাল ''কেনরে হারামির বাচ্চা ওখান থেকে পয়সা নিয়েছিস। তোর বাপের বয়সা।'' এত বড় কাজটা রঘু পারবে না। সে ঠিক আগের মতন ঠাকনার ওপরে টাকা পয়সাগুলো একটা একটা করে সাজিয়ে রেখে বাইরে এসে বসে। ফাঁকা তেঁতুল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার মনে বার বার ফিরে আসছে রাম, রামের লাফঝাঁপ, রামের তেঁতুল গাছ, সেই প্রথম দিনটা যখন রাম নেমে এসেছিল গাছ থেকে। আজ সকাল থেকেই রঘুর মনে কি যেন একটা কু গাইছে। রঘু কাপড়ের ব্যাগটা টেনে আনল। কাপড় জামা সবই আছে। হাত ঢুকিয়ে বের করে আনে নাগার জন্যে রাখা বাদাম। এখন তারই খানিকটা খেল। বেশ মিষ্টি মিষ্টি। তার বাবার কঠিন বারণ চিল। তাই সে এতদিন এসব মুখে দেয়নি; এখন সে স্বাধীন। ইচ্ছামতো খেতে পারে, ঘুরতে পারে, ঘুমোতে পারে। যদিও সে স্বাধীনভাবে খেতে পারল না কেন না কেবলই তার মনে পড়ল বাবা ফিরে অসতে পারে, ফিরে এসেই খোঁজ করতে পারে বাদামের।

বাদামগুলো আবার ব্যাগের মধ্যে রেখে মাঝখানে শুয়ে পড়ে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চোখে পড়ে বাঁশীটা। রাম উঠে বাঁশীতে ফুঁ দেয়। দিতেই থাকে। সুর জাগে। নিজের সুরে নিজেই অবাক হয়ে যায়। ও যে এত ভাল বাজাবে, ও নিজেই ভাবেনি। নিজেই মাথা নাড়ে আার ফিসফিস করে—বাবার মতই হয়েছে। বাবার চেয়ে ভাল অবিশ্যি নয়। তবে খারাপও নয়। শুনলে লোকের মনে হবে যে সেই বুড়োটাই বাজাচ্ছে। অবশ্য মাঝে মাঝে কাশি আসছে; সে জন্য থামতে হচ্ছে। বাবার মতো একটানা হচ্ছে না। বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর কুঁড়ের বাইরে কারখানা ফেরত লোকগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। কাজের মেয়েরা মাথার ঝুড়ি নামিয়ে রাস্তার ওপর একটু জিরিয়ে নিতে বসে বলাবালি করছে যে বুড়োর সুরগুলো আগের চেয়েও যেন একটু ভালো হয়েছে। এরই মধ্যে একজন ঘরের মধ্যে দেখতে যায়। দেখে রঘু একা। একাই বাজাচ্ছে। সে বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল এ যে দেখছি বাপকা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া। তখন আর দেখে কে। সবাই রঘুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। ওইটুকু ছেলে। তার কিনা অমন সুরজ্ঞান, তালজ্ঞান। এ যে একেবারে ওস্তাদ বাজিয়ে। সবার মুখে তখন শুধু রঘুর কথা। বিকেলে ট্যাপ কলের কাছে সবাই জড়ো হয়। চান করে, জল ভরে। সেখানেও সেই একই আলোচনা। অবশ্য এই কলোনীটা তুলে দেওয়ার বহু চেষ্টা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির বহুবার লোকলস্কর, সেপাই সান্ত্রী, যন্ত্রপাতি সব নিয়ে হানা দিয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই ফিরে যেতে হয়েছে। যতবারই কিছু কিছু ঘর ভেঙ্গেছে, ততবারই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সেই দেওয়াল আবার উঠেছে। একদল যেন কাদা মাখিয়ে দাঁড়িয়েই থাকত। হাতে হাতে দেওয়াল তুলে দিত। পরের দিন দুপুরের মধ্যে চালে প্লাস্টিক। প্রতিবারই ঘর যা ছিল তার চেয়ে আরও দু চারটে বেড়ে যেত। আস্তে আস্তে স্থানীয় পুরপিতা বুঝলেন এ অসাধ্য কাজ। তার চেয়ে বরং এদের ভোটটা নিশ্চিত করা যাক। সে এদের খুব কাছের লোক হয়ে গেল। মিটিং -এ এদের দুঃখ কষ্ট মুছে দিতে হবে বলে খুব চেঁচাত আর যখন বিশ্বব্যাঙ্ক বা কোন বিদেশের হোমড়াচোমড়া কেউ ঐ রাস্তা দিয়ে যেত তখন পুরপিতা তার বস্তির গরীব বন্ধুদের নিয়ে দূরে মিটিং করত। রাস্তার ধারে একটাও গরীব মানুষ থাকত না। গোটা এলাকাটা মিটিং এর গেট দিয়ে সাজানো হত। রাস্তার দুপাশ সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। সেখানে ছবি টাঙানো হত, সেখান দিয়ে মিছিল হাঁটত। শ্লোগান তুলত।

সেদিন অবশ্য মিটিং মিছিল কিছু ছিল না। সবাই যে যার কাজে গেল। এক মহিলা এসে তাকে জিজ্ঞেস করে কেন সে আজ কাজে যায়নি? রঘু খুব নীচুগলা বলে তার বাবা আজ কখন বেরিয়ে গেছে সে জানে না। বাবা এখনও ফেরে নি। কোথায় গেছে তাও সে জানে না বলতে বলতে ফোঁপাতে লাগল।

বউটি তার ঝুড়িটি সরিয়ে দিয়ে ওর পাশে বসে জিজ্ঞেস করল— কিছু খাবি? খিদে পায়নি তোর?

—আমার কাছে কিছু টাকা আছে।

বউটি তার মাথার চুলে বিলি কেটে একটু আদর করল। বললঃ আহা রে, তুই বড় হতভাগা। বুঝলি। তোর মাকে আমি জানতাম। অমন ভাল মেয়ে হয় না। আর সে কিনা তোকে এখানে ফেলে রেখে স্বগ্গে চলে গেল।

রঘুর অবশ্য মায়ের স্মৃতি বলতে বিশেষ কিছু নেই। তবুও এসব শুনতে শুনতে রঘু আবার কাঁদল আর গাল বেয়ে গড়িয়ে আসা চোখের জল ঠোঁটের কোণ দিয়ে চেটে নেয় আর বুঝতে পারে চোখের জল কখনও কখনও বেশ মিষ্টিও হয়। রঘু বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই চেটে চেটে জিভ ভেজাচ্ছিল।

বউটি তাকে হঠাৎই প্রশ্ন করে সে এখন কি করবে।

—আমি জানি না। আগে আমার বাবা আসুক। তারপর।

—ওরে বোকা ছেলে। তুই কি চিরটাকাল এরকমই থাকবি। তোর বাবা চলে গেছে, আর ফিরবে না।

—বাবা কোথায় গেছে, বল না।

—সে কথা আমাকে শুধিয়ো না বাবা। বলতে পারব না। জানিও না। আমি যার কাছে শুনলাম সে দেখেছে। ঐ বাস তো পাহাড়ের রাস্তা ধরবে আর একেবারে ওপারের দিকে গিয়ে পাহাড়ের উল্টো দিক দিয়ে নামবে। তবে সঙ্গে সেই নীল সাড়িওয়ালীও গিয়েছে।

—আর আমার রাম। বান্দর। সেও কি সঙ্গে ছিল?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর বউটি দেয় না। ইতিমধ্যে এক সাইকেলওলা এসে দাঁড়ায়। বউটি তাকে পাঁচ টাকার রুটি তরকারি দিতে বলল। ছেলেটা আগে খেয়ে তো বাঁচুক। তার পরের কথা পরে। এই ছোঁড়া আজকের রুটি দিবি। একটাও যেন বাসী না হয়।

—সোনার গিনি দিলেও আমার কাছে কোনো বাসী খাবার পাবে না।

—যাও, ওকে পাঁচ টাকা এনে দাও। শুনে রঘু টাকা আনতে ঘরে গেল। আর বউটি সাইকেলওলাকে বলল যে খানিকটা যেন ফাউ দেয়। ছেলেটা সকাল থেকে কিছু খায়নি আজ।

—কিসের ফাউ?

—ওরে মুখপোড়া। বলছি না রঘুর আজ বড় দুঃখের দিন।

—আমাদের সব দিনই তো দুঃখের দিন। তার আমি কি করব, বল? তুমি বরং তোমার মাকড়ি দুটো বিক্রি করে ওকে পেটপুরে খাওয়াও? তোমার মত লোকের উপদেশ মেনে চললে আমি তো দুদিনে দেউলে হয়ে যাব। এইসব সারকথা বলে টাকা পকেটে পুরে সে ঘন্টি বাজিয়ে চলে গেল।

রঘুর সঙ্গে যেন তার চারপাসের জগতের একটা শান্তি চুক্তি হয়েছে। রঘু নিজে স্বাধীনভাবে এখন তার সমস্যার মুখোমুখি হবে। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ বউটিও চলে গেছে। যাবার সময় আপনমনে বিড়বিড় করছিল, ''ছেনাল মেয়ে। ভাতারখাকী। বাপটাকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গেলি। ওইটুকু ছেলেটা। তার কথা তোর একবারও মনে পড়ল না।'' এর সবটুকুই রঘু শুনতে পেল। সে দরজায় বসে বসে এই সব বার বার ভাবছিল।

রঘু জানে নীল শাড়ি কে। পার্কের পাঁচিল যেখানে শেষ হয়েছে তার পরের বস্তিতে থাকত। সে বহুদিন তাকে দরজায় দাঁড়াতে দেখেছে। ঘরের দরজায় যেন সে লেপ্টে থাকত। তাকে দেখলেই তার বাবার হাঁটা পাল্টে যেত। বেশ আস্তে হয়ে যেত। তারপর বলত, 'তুই বাজারে মাংসের দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়া, আমি আসছি। প্রথম যেদিন এটা ঘটে, রঘু সেদিন বাজাড়ে না ঢুকে একটা ল্যাম্পপোস্টে রামকে বেঁধে আবার সেই জায়গায় ফিরে এসেছিল। বাবার খোঁজে। বাবাকে সেখানে পায়নি। ঐ নীল শাড়িকেও নয়। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। সে দরজার শেকল ধরেছিল কিন্তু নাড়াবার আগেই থেমে যায়। তারপর ঘরের বাইরেই বসে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর তার বাবা ঘাড়ে ঝাঁপি ঝুলিয়ে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রঘুকে ওখানে দেখেই বিরক্তিতে হাত তোলে মারবে বলে। তারপর ধমকায়, ''তোকে বলেছিলাম যে বাজারে গিয়ে বসতে? কথা শুনতে পাস না?'' রঘু চকিতে বাবার নাগালের বাইরে আর দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় নীল শাড়ি বলছে যে সে একটা বদমাইস, অসভ্য ছেলে, শয়তান, দুনিয়ার সব কু-ইচ্ছা ওর ভেতরে।

তার বাবা তাকে বলছে— আমি যখন তোকে বলেছি এখান থেকে চলে যেতে, তুই আমার কথা শুনলি না কেন?

—তুমি এখানে কি করছিলে বাবা? বঘু সরল মনে প্রশ্ন করে।

—তোর তাকে কি দরকার? হারামজাদা!

—ঐ মেয়েটা কে? ওর নাম কি? ও কেন ঐসব বলছে?

—ও আমার আত্মীয়। আমি ওর কাছে চা খেতে গিয়েছিলাম। আর যদি এসব নিয়ে কোন প্রশ্ন করিস তাহলে দুই লাথিতে তোকে দূর করে দেব? বুঝেছিস হারামী।

—হ্যাঁ বাবা। আমি ভেবেছিলাম যে তুমি হয়ত আমাকে ঝাঁপিটা নিয়ে যেতে বলবে, তাই আবার এলেছিলাম।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর কথা নয়। চল চল। অনেক দেরী হল। শুধু জেনে রাখ ও খুব ভাল মেয়ে, সুন্দর মেয়ে।

রঘু অবশ্য তার বাবার মত মানতে পারে নি। মেয়েটা তাকে গাল পেড়েছে। রঘু চেয়েছিল চেঁচাতে; বলতে চেয়েছিল, খারাপ, খারাপ, খুব খারাপ মেয়ে ওটা। তুমি আর ওর কাছে যেয়ো না বাবা। কিন্তু বলা হয়নি। চীৎকারটা গিলে ফেলেছিল। তারপর থেকে যতবার ঐ ঘরের সামনে দিয়ে ওদের যেতে হয়েছে, রঘু তার গতি বাড়িয়েছে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা লম্বা লম্বা পা ফেলত। তারপর অনেকটা এগিয়ে অপেক্ষা করত বাবার জন্য কখনও কখনও তার বাবাও তারই মত লম্বা লম্বা পা ফেলত, দরজার দিকে তাকাত না। রঘু

দেখেছে সেই সেই দিন দরজার সামনে একটা লোমশ হুদকো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদোম পেট চাপড়াচ্ছে।

এরপর কয়েকটা দিন রঘুর খুব এলোমেলো কাটল। দিন চারেক পরে রঘু দেখলে সে খেলাতে পারছে মহারাজকে; আরও দেখল সে ওকে বেশ খাওয়াতেও পারছে। ঠিক যেমনি তার বাবা করত। রঘু এখন বাবার মত বিষদাঁত ভেঙে দিতে পারছে। সে একটু একটু করে বাজারে, বাসস্ট্যান্ডে ঝাঁপি নিয়ে বসতে শুরু করে। রোজগারও খারাপ না। এভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলতে লাগল। হঠাৎ একদিন খেয়াল করে নাগার শরীর ইতিমধ্যে বেশ লম্বা হয়ে গেছে, ভারীও হয়েছে। সে আর এখন সুরের তালে তালে সেরকম দুলতে পারে না। লেজের ওপর ভর দিয়ে আর পুরোটা দাঁড়াতে পারছে না। রঘুর এখনও রামের জন্য দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তার বাবা তাকে সবচেয়ে আঘাত করেছে এই জায়গাটাতে— রামকে তার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে।

এদিকে তার কামাই পড়ে আসছে। আর সেরকম পয়সা পড়ে না। দিনে দিনে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সবদিন এদের পুরো খাবারের পয়সাও জোটে না। রঘু ঠিক করল তার নিজের যা হয় হোক। কিন্তু মহারাজকে ও না খাইয়ে রাখতে পারবে না। মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আর বন্দী করে রাখবে ন।। বরং আর একটা বাঁদর ধরবে, তাকে শেখাবে, তাকে নিয়ে ঘুরবে। রঘু দেখেছে ওর বাবা কি ভাবে রামকে সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল। ঝাঁপি নিয়ে সব ডায়গায় ঢোকা যায় না; কিন্তু বান্দর নিয়ে এমনকি বড় বড় বাড়ীর উঠোনে গিয়েও বসা যায়। আর যদি তা না-ও হয়, ও না হয় স্টেশনে কুলি হবে, আর বাঁদরটাকে পুষবে। একদিন তাকে নিয়ে ট্রেনে করে চলে যাবে অনেক দূরে, কোন বিদেশে। তা সে সব তো পরের কথা; আপাতত সমস্যা হল নাগাকে মাঠে ছেড়ে আসা। নাগার জন্য রোজ দুধ আর ডিম জোগাড় হচ্ছে না। নাগাকে ঝাঁপির ভেতর পুরে হাঁটা দিল নদীর পার বরাবর। হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গা ওর পছন্দ হল। ধারে কাছে কোথাও বসতি নেই। এখান নাগা খোলা মাঠে, খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে কারুর চোখে পড়বে না, কেউ ওকে মারবে না। এখানে নাগার প্রচুর খাবারও মিলবে। নাগাবাবু এখানে নিজের লোকজনদেরও পেয়ে যাবে। বলা যায় না হয়ত ওর মা-বাবাকেও পেয়ে যেতে পারে। নাগা নিশ্চয় এখানে সুখে থাকবে। আমাকে ওর হয়ত আর মনেই পড়বে না। আমার বাবা যেমন চলে গেছে। তার আর আমাকে নিশ্চয় মনে পড়ে না। যাইহোক এবার আমাদের আলাদা হতে হবে নাগাবাবু। আমার বাবা হয়ত তোমাকে ধরে রাখত যতদিন না তোমার ডানা হত, কিন্তু সে আমার লোভ নেই, এই তোমাকে ছেড়ে দিলাম, যাও তুমি।

নাগা কিছুক্ষণ স্থির শুয়ে রইল। একটু পরে সে মাথা তুলে চারপাশের জগতটাকে একবার দেখে খুব উদাসীনভাবে। দেখা শেষে খুব ধীরে ধীরে ভারী শরীরটাকে নিয়ে এগোয়। কিছুটা গিয়ে সে ঘুরল, ফিরে এল ঝাঁপির কাছে। ব্যাপারটা বুঝেই রঘু এক ঝটকায় ঝাঁপিটাকে টান মেরে নদীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। মনে মনে বলে 'যতক্ষণ আমি এখানে থাকব, এ নাগা কোথাও যাবে না'। রঘু এবার নাগার মুখটা ঘুরিয়ে দেয়, একটু দূরেই একটা পিঁপড়ের বাসা আর তারপর সে উল্টোমুখে প্রাণপণ ছুটতে শুরু করে। হাঁপিয়ে যাবার পর একটা গাছের আড়ালে নিশ্চিত হল যাক নাগা এবার একটা গর্ত পাবে, চারপাশে খাবার পাবে। কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টোটা। রঘু দেখে ঢালু রাস্তা দিয়ে নাগা গতি বাড়িয়ে নেমে আসছে। রঘু অস্থির হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে না কেন সে তার নিজের জগতে ফিরে যাচ্ছে না। রঘু ছুটে গিয়ে একটা টিলার ওপর উঠে পড়ে। সেখান থেকে চলমান নাগাকে একটা ঝকঝকে রুপোর ফিতের মতো লাগছিল। রঘু ফেরার জন্যে ঘুরতেই দেখে মাথার উপর চক্কর কাটছে একটা সাদা ঈগল। রঘু মনে মনে 'গরুর' 'গরুড়' বলে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল। হে ঠাকুর, তুমি দেবতা, কিন্তু সাপ তোমার খাদ্য। তবে তুমি আমার নাগাকে যেন খেও না। প্রার্থনায় বিশেষ কাজ হল না। পক্ষীরাজ ইতিমধ্যে অনেকটা নেমে এসেছে। রঘু তার ডানার ছায়া দেখতে পায় মাটিতে। ওদিকে নাগা একইরকম গয়ংগচ্ছ ভাবে আসছে। রঘু মুহূর্তে বুঝে গেল এবার কি হতে পারে। ডানার ছায়া পড়ছে নাগার গায়ে। রঘু ঢাল বেয়ে ছুটতে লাগল। তাকে দেখে বোধহয় ঈগলটা একটু ওপরে ওঠে। রঘু তারই মধ্যে ঝাঁপিটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়য় নাগার দিকে। এদিকে রঘু প্রাণপণ দৌড়েছে, ওদিকে ঈগল সোজা ডাইভ দিয়েছে নাগাকে লক্ষ্য করে। রঘু বিপদ বুঝে আর একবার ঝাঁপিটা ছুড়ে দিল। এক মুহূর্তের ফারাক। নাগা ঝাঁপির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ততক্ষণে ঈগল নেমেছে আর এদিক থেকে রঘু পৌঁছেচে। রঘুকে দেখে ঈগল উড়ে যায়। ঝাঁপির মুখ সোজা করে রঘু দেখল নাগা শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে যেন এইমাত্র সে একটা খেলা দেখিয়েছে। যা দেখে পাবলিক খুশী হয়েছে।

নাগা এখন রঘুর ঘরের এক কোনে থাকে। রঘু একদিন নাগাকে বলল— আর কিছুদিন আমি দেখব, তার মধ্যে যদি তোর ডানা না গজায়, তাহলে আমি তোর মাথায় বাঁশ ভাঙব, আমি আর তোকে খাওয়াতে পারব না। আমি এবার ইস্টিশানে চলে যাব। তখন যদি তুই একা একা ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে ঘরের বাইরে যাস, জানবি সেদিন তোর শেষ দিন। তখন অবশ্য কেউ আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

মূল নাম : নাগা (**Naga**)